‘শোকের ঘরে কে রান্ধে ভাত ছালুন’

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়

সোনারঙ শর্ষেক্ষেতে কুয়াশাভাঙা সূর্যের আলো অবশ্যই তখন ফ্যাকাশে সন্ধ্যাবরণ হয়ে গিয়েছিল। আর আমরা কেঁদেছিলাম। আজও, এখনও কেঁদেই চলেছি। ঘুরছি-ফিরছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি, সংঘ-সভা করছি। কিন্তু টালমাটাল শরীরটা স্বাভাবিক হচ্ছে না। মাথার ভেতরের অস্থিরতাকে কিছুতেই সুস্থির করতে পারছি না। প্রিয় সেলিম আল দীনের এ রকমভাবে চলে যাওয়া কিছুতেই মানা যাচ্ছে না। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের সম্পর্ক। বন্ধুত্বের চেয়েও বেশি কিছু। আত্মীয়তার সীমা ছাড়িয়ে এই দীর্ঘকালীন বন্ধন কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছিঁড়ে যাবে। কোনওদিন ভেবেছি কি! নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু বাষ্পরুদ্ধ গলায় ঠিকই বলেছেন, সেলিমকে ছাড়া কীভাবে চলবে জানি না। এটা আমারও কথা। আমাদের সবার কথা।

সেলিম আল দীন আমাদের শিল্পবন্ধু ছিলেন। শিল্পগুরু ছিলেন। নিরলস সাধনা, গবেষণা এবং সৃজনশীল কাজের ভেতর দিয়ে তিনি প্রাচ্যের যে শিল্পরূপ গড়ার চেষ্টা করেছেন তা তিন যুগ ধরে খুব কাছে থেকে দেখেছি। আর এই কাছাকাছি থাকার ফলে তাঁর কাছ থেকে শিখেছি ঢের, নিয়েছিও ঢের। তাঁর ভাবনা এবং কাজ আমাকে নিয়ত ঋদ্ধ করেছে। ঐতিহ্যবিমুখ ঔপনিবেশিক মানসিকতা এবং জ্ঞানের ফল হিসাবে জন্ম নিয়েছিল বাংলা নাটকের জন্ম ইতিহাস সম্পর্কে ভুল ধারণা। সেলিম আল দীন এই ধারণা শুধরে দিয়ে প্রমাণ করে বলেছেন যে হাজার বছরের ঐতিহ্য অনুসন্ধান, অন্বেষণ না করতে পারলে বাংলা নাটকের ইতিহাস সঠিক হবে না এবং কথায় ও কাজে তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। শুধু ইতিহাস আবিষ্কারই নয়, বাংলা নাট্যরীতিকে বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে সৃষ্টিশীল পন্থায় আধুনিক মঞ্চের যুগোপযোগী করে তোলার দুরূহ কাজটিও তিনি করেছেন সফলভাবে। তুলে এনেছেন লুপ্তপ্রায় নানা লোকজ আঙ্গিক। শেকড়ের অনুসন্ধান করে

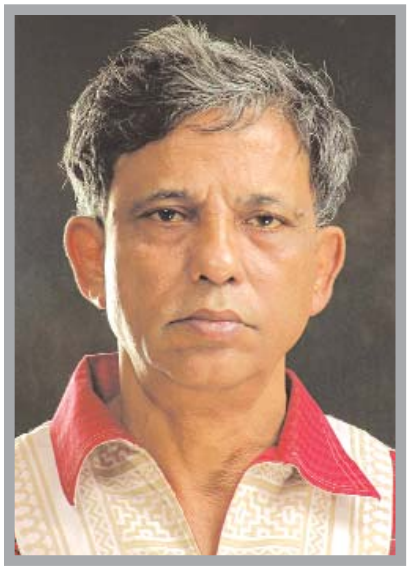

মঞ্চে ফিরিয়ে এনেছেন বাংলা নাটকের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যিক রূপ। বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের শত সহস্র তৃণমূল সহকর্মীর বিশ্বাসে দৃঢ়ভাবে গেঁথে দিয়েছেন অমর স্লোগান ‘হাতের মুঠোয় হাজার বছর আমরা চলেছি সামনে।’ সেলিম আল দীন তাঁর তত্ত্বে ও প্রয়োগে স্বদেশী উৎসের উপরেই মূলত নির্ভর করেছেন বেশি। দুর্মুখেরা অনেক সময় তাঁকে অন্ধ ঐতিহ্যগামী বলেছেন। হ্যাঁ এটা ঠিক যে তিনি মেট্রোপলিটান সংস্কৃতির পরগাছা হতে চাননি। তাঁর ভাবনা ও কাজ এদিক থেকে যেমন নিজের দেশের মাটিতে পোঁতা, তেমনি অন্যদিক থেকে তার ভাষা আন্তর্জাতিক, তার সমৃদ্ধি বৈশ্বিক জলহাওয়ায়। গ্রামবাংলার জীবনের বিচিত্রতা, লোকায়ত সংস্কৃতি, নিসর্গ ইত্যাদি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আহরণে তাঁর ছিল তীব্র নেশা। তাইতো তাঁর নাটকে আমরা বিভিন্ন পেশা ও নৃগোষ্ঠী মানুষের চরিত্রের পাশাপাশি দেখি বাংলার প্রাণীকূল, বৃক্ষ, পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ এমনকি চৈত্রের বাওকুড়ানিকেও। শুধু নাটকের চরিত্রের জন্যেই নয়, ব্যক্তিগত আগ্রহ এবং জ্ঞানার্জনের অসীম নেশা তাঁকে মানুষ, নিসর্গ, প্রকৃতি নানা উপাদানের কাছে প্রতিনিয়ত টেনে নিয়েছে। তিনি সেসব গভীর মমত্ব নিয়ে চিনতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মুখ থেকেই জেনেছি যে জাহাঙ্গীরনগর ক্যাম্পাসেও কতগুলো মুনিয়া পাখি বাস করে তা তিনি মোটামুটি জানতেন। লেকের জলে অচেনা কোন পরিযায়ী পাখি চোখে পড়লে বই ঘেঁটে খুঁজতে চেষ্টা করতেন সেই পাখি সম্পর্কিত অজানা তথ্য। মাছের আকৃতি, রঙ, গড়ন দেখে বলে দিতে পারতেন মাছটি কোন্ নদীর, কোন্ জলের। এই ধরনের অভিজ্ঞতা তাদেরই থাকে যারা থাকেন মাটির কাছাকাছি। ভেষজ দ্রব্যের গুণাগুণ নিয়ে তাঁর সাবলীল কথাবার্তা শুনলে মনে হতেই পারে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নন, বুঝি একজন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক। এই বিষয়টির অর্থবহ অন্তর্ভুক্তি দেখেছি ‘কেরামতমঙ্গল’ নাটকে। যেমন বৃক্ষ গুরুত্ব পেয়েছে ‘বনপাংশুল’ নাটকে। ভেড়া, মোরগ, কাছিম এবং অন্যান্য জলজ প্রাণী ‘হাতহদাই’ নাটকে। ‘প্রাচ্য’ নাটকে সাপ তো প্রধান চরিত্র। নোলকের হত্যাকারী খইয়া গোক্ষুরের সঙ্গে উদ্ভিদের কী অপূর্ব তুলনা! ‘ফাল্গুনের ভোরের রাঙা মেঘাবলী বিচিত্রিত কমলাবর্ণের ফণা। সে উদ্ভিদ। মাটি ভেদ করে উঠেছে। বৃক্ষরাও ভূমিভেদী বিচিত্র ফণা। সে ফণা দোলে চিকন বাতাসে।’ এখানেই সেলিম আল দীন অনেকের থেকে আলাদা, স্বতন্ত্র, নতুন। শত সহস্র বছরের প্রাচ্য দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি মন্থন করে অমিয় তুলে আনার অসাধারণ দক্ষতা ও ক্ষমতা তাঁর। সেলিম আল দীনের প্রতিটি লেখাই আধুনিক এবং সমসাময়িক।

দুই

এখানে এসে আমার কলম থামে। একটা ঘোরের ভেতর আছি। মাথা-মন কিছুই কাজ করে না। কী লিখলাম, আদৌ কিছু গুছিয়ে লিখতে পারছি কি না বুঝতে পারি না। প্রিয় সেলিম আল দীন সম্পর্কে অবিচুয়ারী লিখতে হবে কোনোদিন ভেবেছি কী! অন্তত এই বয়সে। রবীন্দ্রনাথ চুরাশি বছর বেঁচেছিলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সৃজনশীলতার চিহ্নও এঁকে গেছেন। সেলিম আল দীন রবীন্দ্রনাথকে বলতে গেলে প্রফেট ভাবতেন। তাঁর জন্যেও কী রবীন্দ্রনাথের সমান আয়ু নির্ধারিত হতে পারত না! আর মাত্র পনেরটা বছর। সেলিম আল দীন তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর সব আয়োজন ও প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছিলেন। ফাইনাল টেকঅফের ঠিক আগে এরোপ্লেনের যে রকম প্রস্তুতি সেই রকম। সবাইকে দেখা হলেই বলতেন, আর দশটা বছর সুস্থভাবে কাজ করতে পারলেই সব গুছিয়ে নেয়া যাবে।

হায়! মানুষ ভাবে এক হয় আর এক! অলক্ষ্যে হাসেন যিনি তাঁকে খুব জানতেন সেলিম। প্রকৃতিবাদী ছিলেন যে। ল্যাব-এইডের সিসিইউতে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে কৃত্রিম ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা প্রয়োগ করবার আগে শিল্পবন্ধু নাসির উদ্দিন বাচ্চুর দিকে অসহায় তাকিয়ে ম্লান হেসে বলেছিলেন, মৃত্যুর এপাশ আর ওপাশ। মঞ্চকুসুম শিমুলকে বলেছিলেন, গুডবাই শিমুল ইউসুফ। এই তাঁর শেষ কথা শুক্রবারের শেষ রাতে। এখন নিকটজনের কানে তাঁর কত কথা বাজে, তাঁকে দেখি না। মৃত্যুতে ভয় ছিল। প্লেন এবং লিফটে চড়তে অস্বস্তিবোধ করতেন। অথচ তাঁর প্রতিটি নাটকেই মৃত্যুর অবাধ ও শৈল্পিক আনাগোনা। মৃত্যুর বিপক্ষে জীবনের তীব্র আকুতিও পাওয়া যায় তাঁর রচনায়। 'শকুন্তলা' নাটকে সকল চিকিৎসা ব্যর্থ হলে বৃদ্ধ কণ্বমুনী হতাশার সুরে বলেন, 'আমার প্রার্থনা চৈত্রের শিমুল তুলো, লক্ষ্যহীন কেবলই উড়ে যায়, স্পর্শ করে না'। শকুন্তলা লিখবার সময় বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ কী ছাব্বিশ। চূড়ান্ত করবার আগে সতেরো-আঠারোবার খসড়া করেছেন। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা সাদা কাগজের শরীর কলমের ঘায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। ছিঁড়ে ফেলেছেন। ঘরের মেঝে জুড়ে রাতভর জমা হয়েছে পরিত্যক্ত কাগজের পৃষ্ঠা আর সিগারেটের পোড়া টুকরো। সকালে পরম মমতায় সেইসব কাগজ কুড়িয়ে রেখেছেন সর্বংসহা মাতৃরূপেণ পারুল। সাদা কাগজ কখনও তাঁর সামনে দাগহীন অক্ষত থাকেনি। যখন যেভাবে পেয়েছেন কলমের আঁচড় বসিয়েছেন। চারটি বাক্যও যদি রচিত হয়, তাই নিখাদ স্বর্ণকণা। যেকোনও পরিবেশে, যেকোনও পরিস্থিতিতে সেলিম আল দীন গভীর মনোযোগে লিখতে পারতেন যেকোনও বিষয়। এবং সে লেখা হেলাফেলায় উড়িয়ে দেবার সাধ্য কার! সতেরো-আঠারো বছর বয়সে কবি আহসান হাবীবের হাতে লেখক সেলিমের আত্মপ্রকাশ। আহসান হাবীবের অনুপ্রেরণায় নাটক লেখারও হাতেখড়ি। তখন বয়স উনিশ কুড়ি। তারপর থেকে আর থেমে থাকেনি তাঁর রচনা। 'বনপাংশুল' নাটকে মান্দাই গোত্রপর্বান বৃদ্ধ গুণীন মৃত্যুকে এড়াতে বৃক্ষের ভেতর লুকাতে চাইলে সুকী বলে

: দাদা তুমি না এত্ত মরণ দেখছো তবে তারে ডরাও ক্যান ।। গুণীন ঘড়ঘড়ে গলায় উত্তর দেয়–

: না আমি মরণরে ডরাই না। যমের চেহারা ডরাই ।।

মহাকাব্যিক আদলে লেখা 'কীত্তনখোলা' নাটকে প্যাসিভ ছায়ারঞ্জন যখন গভীর শোকে বলে 'বনশ্রী নাই তবুও যাত্রা হচ্ছে' তখন মৃত্যুর এপাশ-ওপাশের সব বাস্তবতা কী অনায়াস ভঙ্গিতে সত্য হয়ে প্রকাশ পায়। সুন্দিবেতের বনের ধারে নদীর নামায়, ভাঙ্গা তাড়ির ঠিলা আর আবর্জনার মধ্যে যাত্রাদলের নায়িকা বনশ্রীবালার শরীর তখন আমকাঠের আগুনে কাঠকয়লা। পুড়ে ছাই হচ্ছে।

প্রিয় বন্ধু সেলিম আল দীন নাই তবুও কেমন খাচ্ছি-দাচ্ছি, ঘুরছি-ফিরছি, সংঘ-সভা করছি। শোকের ঘরে ভাত-ছালুন ঠিকই রান্ধা হচ্ছে।

কেন শূন্যে মিলাও!

রুবাইয়াৎ আহমেদ

বাংলা নাটকের মূল সুর এবং তার গন্তব্য কি হওয়া উচিত এ বিষয়টি প্রথম অনুধাবন করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি সে সম্ভাবনার কথা বলে গেছেন। তাঁর বিখ্যাত 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত ইঙ্গিত রয়েছে। বর্ণনাধর্মিতা, নৃত্য, গীত এবং নিরাভরণ মঞ্চ– এসব বিষয়কে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। বাংলার নাটক প্রকৃতার্থে এসব উপাদানের যথাযথ সংমিশ্রণে নির্মিত হওয়া উচিত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর এ লক্ষে তিনি নাটক রচনা করেছেন। পাশাপাশি অভিনয় এবং নির্দেশনা এ দুটো কাজও করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আধুনিক বাংলা নাটকের প্রস্তাবক, যা দেশজ আঙ্গিককে আত্মস্থ করে দাঁড়াবে নিজস্ব পরিচয়ে। কিন্তু সেই প্রস্তাবকে অকুণ্ঠ সমর্থনে, প্রজ্ঞা আর কর্মের মাধ্যমে বাস্তবে পরিণত করেছেন সেলিম আল দীন। মহান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পথ দেখিয়েছিলেন। সেলিম আল দীন সেই বন্ধুর পথ হেঁটেছিলেন। তিনি শুধুমাত্র নাট্য রচনায় সীমাবদ্ধ থাকেননি, তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণের মতো কঠিন কাজটুকুও করেছেন। এ লক্ষ্যেই লিখেছেন গবেষণা গ্রন্থ 'মধ্যযুগের বাংলা নাট্য'। যার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন, বাংলার নাটকের ঐতিহ্য হাজার বছরের। সেলিম আল দীনের সেই কর্মযজ্ঞে পাশে থেকেছে ঢাকা থিয়েটার, গ্রাম থিয়েটার এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের অগণিত কর্মী-শিক্ষার্থী। বিশেষ করে তাঁর যথাযোগ্য বন্ধু নাট্য নির্দেশক নাসির উদ্দিন ইউসুফ। মূলত তার হাত ধরেই সেলিম আল দীনের নাট্য ভাবনা মূর্তরূপে আবির্ভূত হয়েছে বারংবার। সেলিম আল দীন বলতেন, সব ধরনের কলোনিয়ালিজমের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। বেরিয়ে আসতে হবে পাশ্চাত্য থেকে ধার করা নাট্য আঙ্গিকের কবল থেকে, বিশ্বে মেলে দিতে হবে আমাদের আত্মপরিচয়। তবে তা হতে হবে বিশ্বের অভিজ্ঞতাকে ধারণ করেই। নাট্য রচনার শুরু পাশ্চাত্য প্রভাবজাত হলেও সেলিম আল দীন খুব দ্রুতই নিজস্ব ঘরানা নির্মাণের পথে অগ্রসর হন, নিজের লেখার বাঁক বদল ঘটান। শুরু করলেন নিজ ঘরানার দিকে যাত্রা। লিখলেন *কীত্তনখোলা*, *কেরামতমঙ্গল* আর *হাতহদাই*। মহাকাব্যিক বিস্তারে লেখা এই নাট্য ট্রিলজি এতকাল ধরে প্রচলিত এবং রচিত সব বাংলা নাটককে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। আর কে না স্বীকার করবে এ চ্যালেঞ্জে সেলিম আল দীন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছেন। এরপর ধীরে ধীরে তিনি অগ্রসর হন নিজস্ব শিল্পরীতি নির্মাণে। লিখেন *চাকা*, *যৈবতী কন্যার মন* আর *হরগজ*। বলে-ন এগুলো কথানাট্য। কথার শাসনে রচিত তাই কথানাট্য। সেখানে বর্ণনা আর সংলাপ অদ্বৈতরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। শিল্পী হিসাবে তিনি ছিলেন দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। কবিতা ও গান, গল্প অথবা উপন্যাস কিংবা নাটক এ জাতীয় মাধ্যমগত বিভাজন তিনি স্বীকার করতেন না। অর্থাৎ শিল্পের যাবতীয় মাধ্যমকে তিনি অভেদরূপে দেখার পক্ষপাতী ছিলেন। *বনপাংশুল*, *প্রাচ্য* আর *নিমজ্জন* এসব রচনাই তার সাক্ষ্য বহন করছে। এগুলোতেও ঘটিয়েছেন মহাকাব্যিক বিস্তার। সেলিম আল দীন কোনও বিষয় প্রমাণে এতটাই মরিয়া এবং আপসহীন ছিলেন যে, প্রায় প্রতিটি কাজেই একাধিক উদাহরণ তৈরি করতেন। বাংলা নাটকের আধুনিক রূপ প্রতিষ্ঠায় লিখলেন *কীত্তনখোলা*, *কেরামতমঙ্গল* আর *হাতহদাই*। কথানাট্য আঙ্গিকে নির্মাণ করলেন *চাকা*, *যৈবতী কন্যার মন* এবং *হরগজ*। পাঁচালির আধুনিক রূপ প্রতিষ্ঠায় লেখেন *বনপাংশুল* ও *প্রাচ্য*। অদ্বৈতবাদী শিল্পের নিদর্শন হিসাবে হাজির করলেন *নিমজ্জন*। তিনি বলতেন, অভিজ্ঞতা ছাড়া বড় নির্মাণ সম্ভব নয়। প্রকৃতি হচ্ছে সবচেয়ে বড় শিক্ষক। নিমজ্জনের পর তিনি লিখেন *স্বর্ণবোয়াল* আর *পুত্র*। সম্প্রতি নৃত্যনাট্যগীতি *উষা-উৎসব* লিখে শেষ

করেছিলেন। শুরু করেছিলেন মৃত্যুবিষয়ক ভাবনা-চিন্তা নিয়ে *হাড়হাড্ডি* রচনার কাজ। মাথায় নিয়ে ঘুরছিলেন *ময়ূরযান* নামে অন্য এক রচনার পরিকল্পনা। ভীষণ অবিশ্বাস্য ঠেকে, একজন লেখকের পক্ষে কীভাবে এতগুলো অতুলনীয় নির্মাণ করা সম্ভব হয়। এত এত নির্মাণের কোথাও কোন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটাননি তিনি। কী করে সম্ভব এতটা সচেতন, নির্মোহ আর আধুনিক হয়ে ওঠা! আমাদের বিস্মিত চোখে জীবিত যাপনেও তিনি হয়ে উঠেছিলেন যেন বা পৌরাণিক কোনও চরিত্র। তাঁকে বলতাম পুরাণ-পুরুষ! বিশ্ব শিল্পধারায় 'ফোররিয়ালিজম' বা 'সম্মুখ বাস্তবতা' নামে নতুন একটি শিল্পমতবাদের সূচনা করেছেন *'নিমজ্জন'* লেখার মাধ্যমে।

লেখার পাশাপাশি নাট্য নির্দেশনাতেও সেলিম আল দীন তাঁর ভিন্ন ভাবনার স্বাক্ষর রেখেছেন। এক নতুন ধারা প্রবর্তনের চেষ্টাও করেছেন তিনি। 'উপন্যাসের মঞ্চভ্রমণ' অভিধায় সেই ধারায় দেখাতে চেয়েছেন, মাধ্যম ভিন্নতার কারণে মূল শিল্পটি যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তার স্বাদ, রূপ, রস, গন্ধ আর মাধুর্য যেন অটুট থাকে। উপন্যাসের মঞ্চভ্রমণের মাধ্যমে তিনি হাজির করেন প্রখ্যাত কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল-াহ্‌র বিখ্যাত উপন্যাস *'কাঁদো নদী কাঁদো'*। কোনোরকম বিকৃতি কিংবা নাট্যরূপ ছাড়াই উপন্যাসটি মঞ্চে উপস্থাপন করেন অনিঃশেষ সক্ষমতায়। এ কাজে তিনি কিছুটা সম্পাদনা করেছেন মাত্র, কিন্তু এতে করে মাধ্যমের রূপান্তর ঘটলেও মূলের বিকৃতি ঘটেনি মোটেও।

শিক্ষক সেলিম আল দীনের সান্নিধ্য উপভোগ্য ছিল সবসময়। তাঁর বিরুদ্ধে ক্লাস না নেওয়ার খুব পুরনো একটি অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে কতদিন অজস্র ক্লাস করেছি তার কোনও হিসাব জানা নাই। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন তিনি পছন্দ করতেন। একটি ক্লাস কখন কীভাবে নির্দিষ্ট বিষয়কে ছাড়িয়ে অসংখ্য বিষয়ের সমাহার হয়ে যেত ঠিক ঠাহর করা যেত না। একঘেয়ে মনে হতো না ভীষণ জটিল আর তত্ত্বনির্ভর ক্লাসগুলোও। এর নেপথ্যে ছিল তাঁর অসম্ভব রসবোধের বিষয়টি। ব্যাসদেব, হোমার, কালিদাস, ফেরদৌসী, গ্যাটে, মার্লো, তলস্তয়, চেখভ এঁদের মহান শিল্পভাবনা কিংবা মানবতা প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধ অথবা যিশু তাঁদের যে দুর্ভোগ এসবই ছিল তাঁর চর্চিত ভুবন। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে একা রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর সমগ্র ধ্যান-জ্ঞান জুড়ে। বলতেন, 'পরজন্মে রবীন্দ্রনাথের ভৃত্য হতে চাই।' গান শুনতেন শুধু রবীন্দ্রনাথের। *তোমায় নতুন করে পাবো বলে, হারাই ক্ষণে ক্ষণ.....* কিংবা *শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কী আছে শেষে পথের..* । সেলিম স্যার, যেকোনও বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে সমানসংখ্যক এবং সমান প্রভাবসম্পন্ন যুক্তি উপস্থাপন করতে পারতেন। ফলে আমরা কখনও কখনও বিভ্রান্তির শিকার হতাম। কিন্তু এগিয়ে এসে তিনিই উদ্ধার করতেন আমাদের। বেঁচে থাকার শেষ সময়টুকু গান নিয়ে মেতে ছিলেন। নিজের লেখা আর সুরে একটি অ্যালবাম বের করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন খুব। আমাকে আর মেহেদীকে সহকারী করে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন 'কাঠের যিশু' নামে একটি চলচ্চিত্র। হলো না।

প্রকৃতি এবং রাষ্ট্র বিষয়ক সেলিম আল দীনের ভাবনা কিংবা দর্শন আপাত নিরীহ কিন্তু অন্তর্গত রূপে ভয়ঙ্কর। প্রকৃতির নানা বিপর্যয়কে তিনি খুব স্বাভাবিকভাবে ব্যাখ্যা করতেন। বলতেন, 'কোথাও খরা না দিলে প্রকৃতি অন্য কোথায় বৃষ্টি ঝরাতে পারে না। কোথাও বৃষ্টি কোথাও খরা এটা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। বরং আমরা মানুষেরাই পৃথিবীকে খ খ করে ভিন্ন ভিন্ন মানচিত্র সৃজন করেছি। আর তাতে করেই কোনও মানচিত্রে ধূ ধূ মরুভূমি, কোথাওবা মায়াবী শ্যামলতা।' রাষ্ট্র সম্পর্কে বলেছেন তীর্যক কিছু কথা। নিমজ্জনে আমরা তাই দেখতে পাই, জাতিসংঘকে তিনি রাষ্ট্রসংঘ আখ্যা দেয়ার পক্ষপাতী। কেননা, আধুনিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষ বসবাস করতে পারে। জাতিসংঘে কোনও জাতি নয় রাষ্ট্র প্রতিনিধিত্ব করে। ফলে জাতির সমন্বয়ে সংঘের যে কনসেপ্ট তা আর রইল না। আবার নিমজ্জনেই তিনি পঙ্গু অধ্যাপকের মাধ্যমে বলছেন, আধুনিক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে, সম্মান করে। ফলে শেষ উপনিবেশ থাকার সময় পর্যন্ত ব্রিটেন রাষ্ট্র ছিল না। কী অদ্ভুত!

সেলিম আল দীন বলতেন, কখনও শিল্পদেবী ত্যাগ করলে, মরণ যেন নিকটবর্তী হয়। আমার গুরু তিনি। কোনও এক ভুল বোঝাবুঝির অবকাশে বলেছিলেন 'ক্ষমা, সে তো আকাশ সমান।' গুরু, বুঝে কিংবা না বুঝে করেছি এতসব অপরাধ, আপনি ক্ষমা করেছিলেন তো?

এ বছরের প্রথমদিন, অর্থাৎ ১ জানুয়ারি স্যারের সঙ্গে শেষ দেখা। সেদিন ছিল আমার জন্মদিন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের ৩য় তলায় বিভাগের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। নিচ তলায় স্যার দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে ডাকলেন। আমি নেমে গিয়ে তাঁকে সালাম করলাম। সানি স্যারও (আহমেদ সানি, বর্তমানে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান) সালাম করলেন। তাঁরা দুজনেই বিভাগের মাস্টার্স পরীক্ষা এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। আমি বিভাগের জুনিয়র বন্ধু ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ পর শুনতে পেলাম গুরুগম্ভীর কণ্ঠে আমাকে কে যেন ডাকছেন। পেছনে তাকাতেই বুঝলাম স্যার ডাকছেন। তিনি দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছেন আর আমাকে বলছেন, 'নদীর বোয়াল। দুপুরে বাসায় আমার সঙ্গে খাবি।' পরক্ষণেই মাইমের ভঙ্গিতে ডান হাতের আঙ্গুলগুলো এক জায়গায় করে মুখের কাছটায় নিয়ে খেতে যাওয়ার ভঙ্গি করলেন। হয়তো তাঁর মনে হচ্ছিল আমি কথাগুলো শুনতে পাইনি। তাই নাট্যগুরু আমার জীবনের শেষ সাক্ষাতেও নাটকের ভাষাতেই যোগাযোগ করে গেলেন। সেদিন স্যারের সঙ্গে আর খাওয়া হয়নি। ১০ জানুয়ারি রাতে তিনি প্রথম অসুস্থ হন। ১২ তারিখ রাতে তাঁকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। হাসপাতালে থাকতে থাকতে এখান ওখান তথ্য মেলাতে মেলাতে একসময় বুঝে যাই, স্যার আর এই জনমে ফিরবেন না। ১৪ তারিখ ভোরে ক্যাম্পাস থেকে ঢাকায় আসে চিন্ময়ী (নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের ছাত্রী)। ৪ তলায় স্যারকে দেখে এসে আমাকে বলে, সকালে কালীপুজো করে এসেছি। পুজোর একটি জবাফুল স্যারের পায়ে ছুঁইয়ে দিয়েছি। দাদা, তুমি দেখ স্যার ভালো হয়ে যাবেন। স্যারের একান্ত সচিব স্বকৃত নোমান, ভাগ্নে সজীব সবাই বলেছিল, স্যার ভালো হয়ে যাবেন। আমিও বিশ্বাস করেছি তিনি ভালো হয়ে উঠবেন। কিন্তু হায়! যুক্তি বলছে, তিনি আর ফিরবেন না ধূলিধূসর মায়াময় এই পৃথিবীতে। আবেগ বলছে, ফিরে আসুন, ফিরুন, ফিরতেই হবে। রাতজাগা সঙ্গী বগুড়ার রুবল ভাই ক্ষণে ক্ষণে কাঁদছিলেন আর বলছিলেন, 'খোদা ফিরায়ে দাও!'

ভাবি, আহা! যদি গঠিত হও, তবে কেন শূন্যে মিলাও! আমি বুঝে যাই সময় শেষ হয়ে আসছে। নয়ন আর রুমনকে (দুজনেই নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র) বলি, আমাকে একটি ব-াঙ্ক মেসেজ পাঠাস। অতঃপর বিকালে সব শূন্য হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিতবাহী মেসেজ পেয়ে পালাই জন্মভূমে মায়ের কাছে। আমার শিল্পগুরু সজীব, দৃঢ় আর সৌম্যকান্তি। তাঁর অন্তিম শয়ানের দৃশ্য আমার জন্যে নয়। আমি আজন্ম সেই সচল, গম্ভীর অথচ প্রশ্রয়সুলভ কণ্ঠকেই শুনে যেতে চাই স্মৃতিতে বিস্মৃতিতে। তাই পালাই, দূরে যাই, দূরে গিয়ে প্রতিক্ষণে তাঁকেই তো আরও নিবিড় করে পাই।